বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও উন্নয়নের পথ পরিক্রমা

গোলাম রহমান

জাতি একই সাথে ইতিহাসের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকীএবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছে। ভারত বিভাজন, বাংলাদেশের স্বাধীকার-স্বাধীনতা আন্দেলন ও মুক্তিযুদ্ধ এবংবঙ্গবন্ধুর সংগ্রামীজীবনকথা একই সূত্রে গাঁথা। অন্যদিকে, জন্মলগ্নে যে দেশটিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও পরবর্তীতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জার ”তলাহীন ঝুড়ি” আক্ষায়িত করেছিলেন পঞ্চাশ বছরের পথপরিক্রমের পর সে দেশটি বিশ্বে পরিচিতি পেয়েছে ’উন্নয়নের রোল মডেল’ হিসেবে।

ভারতে তখন বৃটিশ শাসন। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ তারিখে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি শেখ মুজিব বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে গোপালগঞ্জ মিশরারি স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন এবং ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকে তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধে অনপুস্থিত শেখ মুজিবের ভূমিকা ছিল অভূতপূর্ব। স্বাধীকার-স্বাধীনতা আন্দোলন ও সংগ্রামে তাঁর ভূমিকার চেয়ে যুদ্ধকালীন সময়ের ভূমিকাছিল আরও ব্যাপক ও বলিষ্ঠ। মুক্তিযুদ্ধে মুজিবর আর বাংলাদেশ হয়ে পড়েছিল সমার্থ, এক ও অভিন্ন। গানের ভাষায়, ‘‘শোন একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিববের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রণী বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ।” ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে ’বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ’ অঙ্কুরিত হয়েছিল পাকিস্তানের উপনিবেশিক শাসন ও শোষণের সময় তাঁর পরিচর্যায় তা মহিরূহে পরিণত হয় এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ত্রিশলক্ষ প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে।বঙ্গবন্ধু ’বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ’ ধারণ ও লালন করেছেন এবংবলেছেন, ”বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ না থাকলে আমাদের স্বাধীনতার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।”

দেশে ফিরে এসে বঙ্গবন্ধু দ্রুততার সাথে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন ও উন্নয়নে মনোনিবেশ করেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জয়ী জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে ১১ জানুয়ারি তারিখে বাংলাদেশের প্রথম সংসদ গঠন করেন। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রথা অনুযায়ী তিনি প্রধানমন্ত্রীরদায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। দ্রুততম সময়ে সংসদ সংবিধান প্রণয়ন করে এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ থেকে তা কার্যকর হয়। ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ তারিখে প্রথম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৩ টিতে জয়ী হয়। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হয়।

দেশে ফিরার পথেইবঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকেভারতীয় সেনা প্রত্যাহারের অনুরোধ করেন এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীআনুষ্ঠানিকভাবে ১২ মার্চ তারিখে বাংলাদেশ ত্যাগ করে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে মুক্তিবাহিনী সদস্যদের অস্ত্রসমর্পণও সম্পন্ন করা হয়। ভারত থেকে প্রত্যাগত প্রায় এক কোটি শরণার্থী এবং অভ্যন্তরীণভাবে আরও এক কোটিরও বেশিবাস্তুচ্যুত্যের পূনর্বাসন এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত সড়ক ও রেল পথ পুনর্নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা হয়। চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর সচল করা হয়। প্রথম বছর ৩৭% অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। উন্নয়ন কার্যক্রম সুপরিকল্পিতভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিক (১৯৭৩-১৯৭৮) পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। একই সাথে যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে দেশে ঘুষ-দুর্নীতির প্রসার ঘটে। বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, ”বাংলার মাটি থেকে দুর্নীতি উৎখাত করতে হবে। দুর্নীতি আমার বাংলার কৃষক করে না। দুর্নীতি আমার বাংলার শ্রমিক করে না। দুর্নীতি করে শিক্ষিত সমাজ।” তিনি আহ্বান জানান, ‘‘কোন অফিস-আদালতে দুর্নীতি হলে এবং আপনাদের নিকট কেউ ঘুষ চাইলে সঙ্গে সঙ্গে তিন পয়সার একটি পোষ্টকার্ডে লিখে আমাকে জানাবেন। আমি দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করব, যাতে দুর্নীতি চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।” এ সময়েরাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে দেশি-বিদেশি অপশক্তি ষড়যন্ত্রের জাল বোনে। বিদেশ থেকে খাদ্যের চালান আসা বিঘ্নিত হওয়ায় ১৯৭৪ সালে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। নাজুক পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৭৪ এ দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। ১৯৭৫ সালের ২৮ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তণ করেন এবং রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে উন্নয়ন ত্বরান্বিত ও দুর্নীতি উৎখাতের উদ্দেশ্যেতাঁর নেতৃত্বে একক রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম ”বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ” (বাকশাল) প্রতিষ্ঠা করেন। আওয়ামী লীগসহ দেশের সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করা হয়। তাঁর পরিকল্পিতদ্বিতীয় বিপ্লবের রাজনৈতিক কর্মসূচির বাস্তবায়নের সূচনালগ্নে ১৫ আগস্ট দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে সেনাবাহিনীর কয়েক জন কর্মকর্তার হটকারি অভ্যুত্থানে তিনিসপরিবারে নিহত হন। তাঁর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান। অঙ্কুরেই জাতির পিতার দ্বিতীয় বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বঙ্গবন্ধুর সাথে আমার দেখা হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে শুধু একবার। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে প্রথম বিজয় দিবস পালন অনুষ্ঠানে বঙ্গভবনে আয়োজিত অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। তিনি রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরীসহ আমন্ত্রিত অতিথিদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য অনুষ্ঠান স্থলে আসলেন। আমি অবাক বিস্ময় নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। যখন কাছে এলেন, আমি পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত সামরিক হিসাব বিভাগের কনিষ্ঠতম কর্মকর্তা বলে পরিচয় দেই। তিনি হাতধরে বল্লেন, "সততা ও নির্ভিকতার সাথে রাষ্ট্রের আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করবে। নিয়ম-নীতির মধ্যে সকলকে সাহায্য করবে। কাউকে কষ্ট দিবে না।" তাঁর সে উপদেশ আমার সারা কর্ম জীবনের পাথেয় ছিল।

বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকান্ডের পরবর্তী ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সময় ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসের এক কাল অধ্যায়। এই সময়টি ছিল মূলত জেনারেলদের শাসনকাল। প্রথমে জেনারেল জিয়া এবং৩০ মে ১৯৮১ তারিখে তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যুর কিছু দিনের মধ্যে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। উভয়ই সামরিক আইন জারির মাধ্যমে শাসন ক্ষমতা দখল করে রাজনৈতিক দল গঠন করেন এবং পাতানো নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতার বৈধতা দেন। এ সময়ে জিডিপি'র বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ছিল চার শতাংশের কাছাকাছি বা তারও কম। মাথাপিছু আয়ের স্থবিরতা, উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং দুর্নীতির ব্যাপক প্রসারের ফলে এরশাদের শাসনের বিরুদ্ধে গণঅসোন্তষ দেখা দেয় এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের আন্দোলনের মুখে তিনি ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ তারিখে পদত্যাগ করেন। প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহামেদ অস্থায়ীরাষ্ট্রপতি মনোনীত হন এবং তাঁর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জয়লাভ করে বেগম জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠন করে। তাঁর শাসনকালে জিডিপির প্রবৃদ্ধি কিছুটা বাড়ে। প্রথমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণেথাকলেও ১৯৯৫ এ তা ১০% অতিক্রম করে। মাগুরার উপ-নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ উঠে। বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ নির্বাচনকে অবাধ ও নির্বাচনের সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে নির্বাচনকালীন সময়ে তত্ত্বাধায়ক সরকার প্রথাপ্রবর্তণের দাবি উত্থাপন করে। সরকার এই দাবি অসংবিধানিক ও অবাস্তব মনে করে। ১৫ ফেরুয়ারি, ১৯৯৬ তারিখে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিরোধী দলসমূহ নির্বাচন বর্জন করে এবং দুর্বার গণআন্দোলনের সূচনা করে। দেশে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। নতুন সংসদের একমাত্র অধিবেশনে ২১ মার্চ, ১৯৯৬ তারিখে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাশ করা হয়। রাষ্ট্রপতি ৩০ মার্চ তারিখে সংসদ ভেঙ্গে দেন এবং বেগম জিয়া প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় এবং তাঁর সময়ে ১২ জুন, ১৯৯৬ তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে এবং শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তাঁর শাসনামলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালে ৫.৬% উন্নীত হয়।মুদ্রাস্ফীতিও নিয়ন্ত্রিত থাকে। ২০০১ সালের ১৫ জুন বিচারপতি লতিফুর রহমান প্রধান উপদেষ্টার শপথ গ্রহণ করেন। সে সময়ে আমি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সচিব ছিলাম। দায়িত্ব গ্রহণের কয়েক মিনিটের মধ্যে তিনি ১৩ জন সচিবের বদলির আদেশ জারি করেন, তবে আমার বদলির আদেশ পরে বাতিল করা হয়। তাঁর সরকার আওয়ামী লীগ সরকার গৃহীত বেশ কিছু পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত বাতিল করে।নিরপক্ষাতার লেবাসে তার সরকারেরকার্যক্রম ছিল পক্ষপাত দুষ্টু। এতে আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন হয়। ১ অক্টোবর ২০০১ তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিএনপি জয়ী হয় এবং বেগম জিয়া আবারও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

তাঁর এ মেয়াদে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। জঙ্গিবাদের ব্যাপক উত্থানের ফলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দৃশ্যমান অবনতি হয়। সে সময়ে ৬৪ জেলায় এক সাথে বোমা হামলা, চট্টগ্রামে ১০ ট্রাক অস্ত্র উদ্ধার, ২১ আগষ্টে শেখ হাসিনার প্রাণনাশের চেষ্টায় আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলাসহ অসংখ্য নেক্কারজনক ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশ পরপর ৫ বছর একনাগাড়ে ট্রান্সপারেন্সি ইনটারনেশানালের ধারণাসূচকে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়। সার, বিদ্যুৎসহ নানা পণ্যের সরবরাহ সংকটের ফলে বিভিন্ন স্থানে গণঅসোন্তষ দেখা দেয়। সরকার পছন্দের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধন করে বিচারপতিদের বয়স বৃদ্ধি করে। বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের আন্দোলনের মুখে বিচারপতি কে এম হাসান প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন অহম্মেদ নিজেই প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর পক্ষপাতমূলক আচরণে দেশে চরম রাজনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টির প্রেক্ষিতে অর্থ উপদেষ্টা ডঃ আকবর আলীসহ ৪ জন উপদেষ্টা পদত্যাগ করেন। তা সত্ত্বেও বৈষম্যমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত না হয়ে তিনি ২২ জানুয়ারি ২০০৭ তারিখে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন ধার্য করেন। তাঁর অধীনে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে সংশয় অব্যাহত থাকে এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেয়। দেশব্যাপী রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সংঘাত ব্যাপক আকার ধারণ করে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপে ১১ জানুয়ারি, ২০০৭ তারিখে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে নির্বাচন স্থগিত করেন এবং প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করেন। পরদিন ডঃ ফখরুদ্দীন অহমেদের নেতৃত্বে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক

সরকার গঠন করা হয় এবং সরকার ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের রোডম্যাপ ঘোষণা করে। ২৯ ডিসেম্বার ২০০৮ তারিখে যথারীতি নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জয়ী হয়ে ৩ জানুয়ারি ২০০৯ তারিখে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।উচ্চ আদালতে আপিল বিভাগের রায়ের প্রেক্ষাপটে ২০১১ সালে গৃহীত সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে নির্বাচন কালিন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রথার বিলুপ্তি ঘটে।

২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ আবারও শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠন করে। তাঁর নেতৃত্বে দীর্ঘ সময় সরকার পরিচালিত হওয়ায় উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা সম্ভব হয় এবং করোনা মহামারি দেখা দেওয়ার পূর্বে বার্ষিক জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার আট শতাংশে উন্নীত হয়। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে সক্রিয় উন্নয়ন পর্যায়ে (Self-sustaing stage) পৌঁছে গেছে। করোনা মহামারির নেতিবাচক প্রভাব সত্ত্বেও দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা থামেনি। আইএমএফ এর হিসেবে ২০২০ সালে প্রতিবেশী ভারতের জাতীয় আয় ১০.২% সঙ্কুচিত হওয়ার বিপরীতে বাংলাদেশের আয় বেড়েছে ৩.৮% (সরকারি হিসেবে ৫.২%)। প্রথম বারের মত বাংলাদেশে মাথাপিছু গড় আয় ভারত ও পাকিস্তানের গড় আয়কে অতিক্রম করে। বাংলাদেশের গড় আয় এখন বার্ষিক ২,৫০০ মার্কিন ডলারের অধিক। বিশ্বব্যাংক বেশ আগেই বাংলাদেশকে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন-মধ্যবিত্তের দেশ হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করেছে। জাতিসংঘ নির্ধারিত মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতাসূচকের মানদণ্ড উত্তীর্ণ হওয়ায় সংস্থাটি বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে ২০২৬ সালে, প্রস্তুতিকালীন সময় অতিক্রন্ত হওয়ার পর, উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জন্মলগ্নে যে দেশটিকে আক্ষায়িত করা হয়েছিল 'তলাহীন ঝুড়ি' পঞ্চাশ বছরের পথ পরিক্রমার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তা এখন 'উন্নয়নের রোল মডেল'। যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর ইকোনমিকস এন্ড বিজনেস রিসার্চ (সিইবিআর) প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ২০৩২ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের বড়ো ২৫টি অর্থনীতির দেশের একটি হবে। তখন বাংলাদেশ হবে ২৪ তম বৃহৎঅর্থনীতির দেশ। বর্তমানে অবস্থান ৪১তম। ২০৩৩ সালে বাংলাদেশের পেছনে থাকবে মালয়েশিয়া, সুইডেন. সুইজারল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ আফ্রিকার মত দেশ।

শেখ হাসিনার হাত ধরে জাতি স্বপ্ন দেখছে ২০৪১ সালে বাংলাদেশ হবে উন্নত বিশ্বের অংশ। তবে সবই নির্ভর করবে সংঘাত-সহিংসতা পরিহার করে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের মাধ্যমে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষারউপর। জাতির পিতা সূচনা করেছিলেন 'দ্বিতীয় বিপ্লব'। দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে তাঁর হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে তা অঙ্কুরেই থেমে যায়। দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসরত কয়েক কোটি মানুষসহ সর্বসাধারনের জীবনমানের দৃশ্যমান উন্নয়ন, মাথাচাড়া দিয়ে উঠা আয় বৈষম্য, দুর্নীতির প্রসার ও পণ্যমূল্যের উর্দ্ধগতি রোধ, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন এবং'উন্নয়নশীল দেশ' হিসেবে শ্রেণিভুক্ত হওয়ার পর বিশ্ব অর্থনীতির প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য দেশকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের 'তৃতীয় বিপ্লব' অবশ্বম্ভাবি হয়ে পড়েছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পক্ষেই কেবল এই বিপ্লবের সূচনা করা সম্ভব। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কোনো বিকল্প নেই।

#

২৭.০১.২০২২ পিআইডি ফিচার